তুর্কী জাতির উত্তর ভারত জয়ের সফলতার কারণ (The causes of Turkish success in Northern India) ঃ মুহম্মদ ঘুরী ও তাঁর অনুচর কুতবউদ্দিন আইবকের নেতৃত্বে তুর্কী অভিযানকারীরা যেরূপ দ্রুত গতিতে উত্তর ভারত জয় করে ফেলে তা আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তার আগে সুলতান মামুদও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান দ্বারা ভারতীয় রাজাদের পরাস্ত করেন। ভারতের শাসক রাজপুত শক্তি যেন তুর্কী সেনাদের সম্মুখে হীনবীর্য হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে রাজপুত সেনাদের মধ্যে সাহস ও শক্তির অভাব দেখা যায়নি, একথা সত্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যেন রাজপুত তথা হিন্দু শক্তি ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তুর্কীদের সামান্য আঘাতেই তা ভেঙে পড়ে। তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন গণ প্রতিরোধও ভারতে দেখা যায়নি। তুর্কী জাতির উত্তর ভারতে ঐতিহাসিক জয় সমকালীন ঐতিহাসিকদের মনে কোন প্রশ্ন বা বিস্ময় সৃষ্টি করেনি। ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে প্রধানতঃ নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে

সমকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকদের দৈবী ব্যাখ্যা

তাঁরা ভারতীয় বীরের ব্যক্তিগত বীরত্বের বড়াই করেছেন। তুর্কী ঐতিহাসিক উৎবী, মিনহাজ ও হাসান নিজামী তুর্কীদের বিজয়কে ইসলামের অবধারিত জয় ও আল্লাহের আশীর্বাদের ফল বলে মনে করেছেন। একমাত্র ফক্‌র-ই-মুদাব্বির তাঁর আদাব-উল-হারাব গ্রন্থে কিছু ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে "তুরুক সওয়ার" অর্থাৎ অশ্বারোহী তুর্কী সেনা ছিল সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তার সামনে রাজপুতরা তাদের পুরাতন রণকৌশল নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

বস্তুতঃপক্ষে সামরিক দিক থেকে তুর্কীরা ছিল ভারতীয় রাজপুত সেনা অপেক্ষা উন্নত। হিন্দু সেনাদল হাতীর দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করে শত্রুর বাহিনী ছত্রভঙ্গ করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তুর্কী তীরন্দাজদের তীরের ও বল্লমের ঘায়ে হাতীগুলি জখম হয়ে নিজ পক্ষের লোকেদের মাড়িয়ে দিত। তুর্কী অশ্বারোহীর মত দ্রুতগামী সুশিক্ষিত আক্রমণপটু সেনা রাজপুতদের হাতে ছিল না। রাজপুত পদাতিক ও হস্তীবাহিনী ছিল মন্থরগামী। তুর্কী অশ্বারোহীরা দ্রুতগতিতে জনপদগুলি অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ওপর আঘাত হানত। বিপদ বুঝলে তারা সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হঠে চলে যেত। ঘোড়ার পিঠে সওয়াররা ছুটন্ত অবস্থায় তীর ছুঁড়তে পারত এবং বল্লম দ্বারা শত্রুকে আঘাত করত। পদাতিক রাজপুতরা তরবারির দ্বারা এই বাহিনীর মোকাবিলায় ছিল অক্ষম। রাজপুতরা যুদ্ধের জন্যে কোন ভাল অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করতে পারেনি। ডঃ নিজামীর মতে, দ্রুতগতি অশ্বারোহী সেনা ছিল তুর্কী সামরিক সংগঠনের চাবিকাঠি... এই যুগটি ছিল অশ্বারোহী সেনার যুগ ("Mobility was the key note of Turkish military organisation.... It was the age of horse".)।

তুর্কীদের সামরিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্ব

রাজপুতদের সেনা ও ব্যূহ সংগঠন ছিল প্রথাসিদ্ধ। কিছু সৈন্য ডাইনে, কিছু বামে ও কিছু মাঝখানে থাকত। তুর্কীরা রাজপুত সেনা সংগঠনের দুর্বলতা ধরে ফেলে। তুর্কীরা এই তিনটি স্থানে সেনা স্থাপন করত, তদুপরি একটি অগ্রবর্তী বাহিনী ও একটি সংরক্ষিত বাহিনী রাখত। অগ্রবর্তী বাহিনী প্রথম সংঘাতে শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করত ও দুর্বল স্থান লক্ষ্য করত। যুদ্ধ চলার সময় শত্রুর দুর্বল স্থানে সংরক্ষিত বাহিনী আঘাত করত। এর ফলে শত্রু হঠে যেতে বাধ্য হত। তাছাড়া তুর্কীরা অতির্কিত আক্রমণে পটু ছিল। তুর্কীরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করত। রাজপুতরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকত। তুর্কীরা সর্বদা গুপ্তচর দ্বারা শত্রুর গতিবিধির খবর নিত। রাজপুতদের এরূপ কোন গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল না।

রাজপুতদের পুরাতন পন্থায় যুদ্ধ

তুর্কীদের যে সামরিক নেতৃত্ব ছিল রাজপুতদের ক্ষেত্রে ছিল তার একান্ত অভাব। মুহাম্মদ ঘুরী ও তাঁর সহকারী কুতব-উদ্দিন আইবেক ছিলেন নেতৃত্ব গুণের অধিকারী। সমগ্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিকল্পনামত তাঁরা চালাতে সক্ষম ছিলেন। বিপর্যয়ের সামনে তাঁরা সেনাদের মনোবল ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু রাজপুত সেনারা ছিল সামন্ত সেনা। বিভিন্ন সামন্তদের নিজ নিজ সেনা নিয়ে প্রভুর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিত। এই সেনাদলকে একই প্রকার রণকৌশলে শিক্ষিত করা সম্ভব ছিল না। এই সেনাদলের রণদক্ষতা সমান ছিল না। এই সেনাদল কোন একজন নেতার অধীনে শিক্ষিত না হওয়ায় এদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ছিল না। তাছাড়া তুর্কী সেনাদল ধনরত্ন লুণ্ঠন ও ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য নিয়ে লড়াই করে। হিন্দু সেনার মধ্যে কোন আদর্শবাদ ছিল না।

সামন্ত রাজপুত সেনার দক্ষতার অভাব ও নেতৃত্বের শূন্যতা

রাজনৈতিক দিক থেকে দেখা যায় যে, ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকার ফলে তুর্কী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্থানীয় ভিত্তিতে রচিত হয়। তুর্কীরা ধাপে ধাপে উত্তর ভারত জয় করার সুযোগ পায়। স্থানীয় বাধার দরুন এবং কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছিল দুর্বল ও অপ্রচুর। যদিও কোন কোন রাজপুত রাজার রাজ্য বেশ শক্তিশালী ছিল এবং জনবলও বেশী ছিল, কিন্তু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তার কোন ছাপ পড়েনি। একটি বা দুটি যুদ্ধে পরাস্ত হলেই হিন্দু রাজারা বশ্যতা স্বীকার করত।

কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব, স্থানীয় প্রতিরোধ

রাজপুত রাজারা পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করে। বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে তাদের চেতনা ছিল না। রাজপুত রাজাদের মধ্যে এমন কোন নেতা ছিল না, যে ব্যক্তি এই বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে আক্রমণকারীর মোকাবিলা করতে পারে। তাছাড়া শাসক ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ও উচ্চবর্ণের লোকেদের স্বার্থপরতার জন্যে দেশের বেশীর ভাগ নিম্নবর্ণের লোক নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে চলতে থাকে।

রাজপুত রাজাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

হিন্দুদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল তাদের পরাজয়ের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। আর· সি· দত্ত, ডাঃ হাবিব প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা হিন্দু সমাজের অবক্ষয় ও রক্ষণশীলতাকেই তাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ বলে মন্তব্য করেছেন। ডাঃ ইউ· এন· ঘোষাল অবশ্য সামরিক কারণকেই বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থা তাদের পরাজয় ডেকে আনে এতে সন্দেহ নেই। (ক) হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতার জন্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ। সমাজের এই শোষিত ও অবহেলিত শ্রেণী তুর্কী আক্রমণের সময় নিষ্ক্রিয় ছিল। তারা শাসক ক্ষত্রিয়দের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কারণ তারা মনে করত যে, যেহেতু ক্ষত্রিয়রা শাসন ক্ষমতার অধিকারী, দেশ রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই। কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আগন্তুক তুর্কীদের পক্ষে যোগ দেয়। এরূপ ঘটেছিল জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ও নিম্নবর্ণের লোকেদের শোষণের জন্যে। ডাঃ কে· এস· লাল মন্তব্য করেছেন যে, "যে সমাজ এরূপ অন্যায় ও বৈষম্যের ওপর স্থাপিত ছিল তার থেকে বিশ্বাসঘাতকের উদ্ভব হওয়া ছিল স্বাভাবিক"।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল, নীতিহীন সমাজ ব্যবস্থা

(খ) হিন্দু সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ভয়ানকভাবে দেখা দিয়েছিল। এর ফলে সমাজে শৃঙ্খলা ও আদর্শবাদ বলতে কিছুই ছিল না। মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা, তন্ত্রধর্মের প্রসার; ধর্মের নামে কুসংস্কার ও কুপ্রথার পালন সমাজের প্রাণশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। হিন্দু সমাজ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। পুরুষদের বহু বিবাহ, সতীদাহ, নারীদের প্রতি অবিচার সমাজকে পঙ্গু করে ফেলে। হোলক উৎসব ও বসন্ত উৎসবের নামে ব্যাভিচার প্রশ্রয় পায়। এমন কি দেব-দেবীর জীবন নিয়ে কাব্য রচনাতেও অশ্লীল রসের প্রভাব এই যুগে বৃদ্ধি পায়। পুরী, কোনার্ক, খাজুরাহোর ভাস্কর্যগুলি শিল্পগুণে খুবই উন্নত হলেও, অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এযুগের নিম্নরুচি ও অবক্ষয়ের পরিচয় দেয়। (গ) মোট কথা হিন্দু সমাজে গতিশীলতা না থাকায়, সমাজব্যবস্থা তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। সমাজে সৃজনশীলতা না থাকায়, পুরাতন ব্যবস্থা ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকে। তার স্থলে নতুন ভাবধারা গড়ে ওঠেনি। যুগের উপযোগী রাষ্ট্রগঠন করা হয়নি।

ধর্মীয় কুসংস্কার ও অবক্ষয়

অর্থনৈতিক দিক থেকে সামন্ত প্রথার প্রভাবে জমিগুলি সামন্ত শ্রেণীর হাতে চলে যায়।

সাধারণ কৃষকরা শোষিত হতে থাকে। পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে যে সম্পদ জমা হয় তা শুধু ধনী বণিক ও শাসকশ্রেণীর হাতে ছিল। মন্দিরগুলি ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। কিন্তু ধনবণ্টন না হওয়ায় সাধারণ লোক ও নিম্নবর্ণের লোকেরা বেশ দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটাত। গ্রামগুলিতে বহু কৃষক ভূমিদাসের মতই জীবন কাটাত। শহরগুলিতে ধনীদের গৃহে বহুলোক দাস হিসেবে জীবন কাটাতে বাধ্য হত। এজন্যে সমাজের বৃহৎ অংশে হতাশা ও নৈরাশ্যপীড়িত লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। উচ্চবর্ণের হাতে ও মন্দিরে প্রভূত ধনরত্ন থাকলেও তার দ্বারা নতুন সেনাদল গঠন ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টা করা হয়নি।

সামন্তপ্রথা ও সাধারণ কৃষকের শোষণ

সাধারণভাবে হিন্দু সমাজ ছিল প্রচণ্ড গোঁড়া ও রক্ষণশীল। কোন প্রকার প্রগতিমূলক চিন্তা সমাজে প্রবাহিত করা দুষ্কর ছিল। মধ্য এশিয়ায় রণকৌশলে যে বিপ্লব এসেছিল হিন্দুরা তা গ্রাহ্য করত না। তারা মনে করত যে, হিন্দু সভ্যতা ও রাজ্য চিরস্থায়ী। আলবিরুণী বলেছেন যে, হিন্দুদের কোন নতুন প্রথা বা সংস্কার গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না। তারা কোন পরিবর্তনকে স্বীকার করত না। হিন্দু সমাজ ছিল এক বদ্ধ, অচলায়তন বিশেষ। এই সকল কারণে হিন্দু রাজ্যগুলির দ্রুত পতন ঘটে।